বাংলাদেশে মাদ্রাসা শিক্ষার হাল

বাংলাদেশে প্রচলিত মাদ্রাসা শিক্ষা নিয়ে জনমনে নানা প্রশ্ন রয়েছে। মাদ্রাসা একটি আরবী শব্দ। এর বাংলা প্রতিশব্দ হওয়া উচিত পাঠশালা। কিংবা বিদ্যালয়। কিন্তু, কার্যক্ষেত্রে ইসলাম ধর্ম বিষয়ক শিক্ষাকেন্দ্র হিসাবেই মাদ্রাসাগুলো পরিচিত। ধর্মীয় শিক্ষার প্রশ্নে কারো কোনো আপত্তি থাকবার কথা নয়। ধর্ম শিক্ষা কোনো অপ্রয়োজনীয় বিষয়ও নয়। তদুপরি বাংলাদেশের মানুষের ধর্মানুরাগ প্রশ্নাতীত। এখানে ধর্মীয় শিক্ষার প্রতি সাধারণ মানুষের আগ্রহ কম নয়। অনেকে বিষয়টিকে জরুরী বলেও বিবেচনা করেন। আর প্রচলিত সাধারণ ধ্যান-ধারণা অনুযায়ী মাদ্রাসা শিক্ষা এবং ধর্মীয় শিক্ষা অভিন্ন অর্থ বহন করে, যদিও সাধারণ বিদ্যালয়েও ধর্মীয় শিক্ষার বিধান ও সুযোগ রয়েছে। প্রশ্ন হলো, ধর্মীয় শিক্ষার নামে কার্যক্ষেত্রে এদেশে কি চলছে? ধর্মীয় শিক্ষার জন্য অপরিহার্য পরিচ্ছন্ন পরিবেশ কি সব মাদ্রাসায় আছে? যারা মাদ্রাসায় লেখাপড়া করে এবং যাঁরা ওইসব প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থাপনা ও শিক্ষকতার দায়িত্বে নিয়োজিত রয়েছেন তারাইবা কতটা ধর্মানুবর্তী? এই প্রশ্নগুলো একালে অনুপেক্ষণীয় হয়ে দাঁড়িয়েছে।

সাম্প্রতিককালে, একটি সহযোগী দৈনিকে মাদ্রাসা শিক্ষার হালফিল পরিস্থিতি সম্পর্কে ধারাবাহিকভাবে বিস্তারিত রিপোর্ট প্রকাশিত হয়েছে। এই রিপোর্ট পড়ে ধর্মপ্রাণ মানুষের বিবেক আঁতকে ওঠার কথা। সিরিজ রিপোর্টে যে সমস্ত তথ্য-প্রমাণ উপস্থাপন করা হয়েছে তাতে দেখা যায়, এদেশের মাদ্রাসা শিক্ষা আকণ্ঠ নিমজ্জিত দুর্নীতি-দুরাচারের কাদাজলে। মাদ্রাসার অনুমোদন, মঞ্জুরি, পাঠ্যক্রম, পরীক্ষা, নিয়োগসহ সর্বক্ষেত্রে রন্ধ্রে রন্ধ্রে দুর্নীতি আর স্বেচ্ছারিতার অবাধ চর্চা চলছে ধর্মীয় শিক্ষার নামে। মাদ্রাসা শিক্ষকদের সমিতি জমিয়াতুল মুদাররেসীন নাকি মাদ্রাসা শিক্ষার অলিখিত মালিক-মোখতার। এই সমিতির নেতা বা নেতারা— যা চান, যেমনভাবে চান, মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড সেভাবেই চলে। এ প্রসঙ্গে তথ্যাভিজ্ঞমহলের ভাষ্য এই যে, জমিয়াতুল মুদাররেসীনের নেতাদের চাওয়ার সাথে ধর্মীয় আদর্শের বিন্দু-বিসর্গও মিল নেই। তারা যা চায় এবং যা করে তা বেশীরভাগ ক্ষেত্রেই অধর্ম বা অনাচার হিসাবে পরিগণিত হতে পারে। মাদ্রাসা শিক্ষার শিরায় শিরায় নাকি দুর্নীতি ছড়িয়ে দেয়া হয়েছে। ওপর থেকে নীচ পর্যন্ত, সংঘবদ্ধভাবে দুর্নীতির অনুশীলন করে যাওয়া হচ্ছে মাদ্রাসা শিক্ষার ক্ষেত্রে। ব্যাংঙের ছাতার মত শহর এবং গ্রামাঞ্চলে নামকাওয়াস্তে মাদ্রাসা গড়ে তোলা হয়েছে। বেশীরভাগ ক্ষেত্রে এইসব মাদ্রাসায় সমাজের দশের কোনো অংশগ্রহণ নেই। ব্যক্তিগত তেল-তদবির ও লাইনঘাটের মাধ্যমে বহু মাদ্রাসা স্থাপিত হয়েছে, যেগুলো পরিচালনার জন্য কোনো কমিটি আছে কি নেই, কেউ জানে না। ওই সমস্ত মাদ্রাসা ব্যক্তিগত ব্যবসায় (অনুদানের টাকা তুলে খাওয়ার) প্রতিষ্ঠান হিসাবে চালানো হচ্ছে। সরকারী নীতি অনুযায়ী একটি জেলায় মাত্র ১টি ফাজিল মাদ্রাসা থাকতে পারে। কিন্তু, বেশীরভাগ ক্ষেত্রে এর চেয়ে অনেক বেশী মাদ্রাসা অনুমোদন লাভ করেছে। জানা যায়, কেবল চট্টগ্রাম জেলাতেই আছে ১৪টি মাদ্রাসা। লক্ষ্মীপুর, কুমিল্লা, চাঁদপুর, দিনাজপুর ও সিলেট জেলায় প্রত্যেকটিতে নাকি পাঁচটি করে কামিল মাদ্রাসা রয়েছে। নোয়াখালীতে আছে সাতটি। ঝালকাঠি জেলার রাজাপুর এই একটি মাত্র থানায় মঞ্জুরিপ্রাপ্ত মাদ্রাসার সংখ্যা ৫৬টি। গড়ে পাঁচশ করে শিক্ষার্থী ধরা হলেও ৫৬টি মাদ্রাসার জন্য ২৮০০০ (আটাশ হাজার) ছাত্র প্রয়োজন। বাংলাদেশের যে কোন থানায় এটা অকল্পনীয় এবং অসম্ভব। তদুপরি সরকারী বিধান অনুযায়ী, একটি দাখিল মাদ্রাসা থেকে অপর একটি দাখিল মাদ্রাসার দূরত্ব কমপক্ষে ৪ মাইল এবং একটি ফাজিল মাদ্রাসা থেকে অপর একটি মাদ্রাসার দূরত্ব হতে হবে কমপক্ষে ৮ মাইল। এই হিসাবে যে কোনো থানার আয়তনের মধ্যে ৫/৬টির বেশী মাদ্রাসা হতে পারে না। কিন্তু, মাদ্রাসা ব্যবসায়ী তথাকথিত ধর্মীয় শিক্ষাব্রতীরা এবং মাদ্রাসার শিক্ষা ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষের তেলেসমাতিতে এক থানায় অর্ধশতাধিক মাদ্রাসা স্থাপন করা সম্ভবপর হয়েছে এবং ওইসব মাদ্রাসা যথারীতি শিক্ষকদের নামে বেতন এবং অন্যান্য মঞ্জুরি তুলে নিচ্ছে। বাস্তবে সেই মাদ্রাসাগুলো আছে কি নেই, থাকলেও ওইসব মাদ্রাসার ছাত্র-শিক্ষক আছে কিনা— সে খবর রাখবার মনে হয় কেউ নেই। কেবল ঝালকাঠি নয়, সারাদেশেই কমবেশী এই অপকর্ম চলছে।

মাদ্রাসার পাঠ্যক্রম এবং বিভিন্ন পর্যায়ের পরীক্ষা— সেখানেও নাকি ভানুমতির খেলা চলে অবাধে। মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ডের পরীক্ষা বিষয়ক কমিটির যিনি প্রধান তিনি নাকি জমিয়তুল মুদাররেসীনের প্রধান। ১৯৯৬ সালে তিনজন টেবুলেটরের বিরুদ্ধে দুর্নীতি দমন বিভাগ মামলা দায়ের করে। এরা প্রত্যেকেই নাকি মাদ্রাসার প্রিন্সিপাল। আর এদের বিরুদ্ধে অভিযোগ হচ্ছে, গাজীপুর, দুর্বাট ও শ্রীপুর কেন্দ্রের ২৭ জন পরীক্ষার্থীর নম্বর পরিবর্তন করে উচ্চতর বিভাগে উত্তীর্ণ করিয়ে দেয়া। অর্থাৎ যে বা যারা তৃতীয় বিভাগ পেয়েছে তাদের ২য় বিভাগে এবং যে বা যারা ২য় বিভাগ পেয়েছে তাদের ১ম বিভাগ দিয়ে দেয়া হয়েছে নম্বরপত্র ঘষামাঝা করে। পাঠ্যক্রম, সেই যাচ্ছে তাই। মাদ্রাসা শিক্ষার আধুনিকায়নের লক্ষ্যে আরবী শিক্ষার পাশাপাশি সাধারণ বিদ্যালয়ের মত মাদ্রাসা পাঠ্যক্রমেও বাংলা, ইংরেজী বিজ্ঞান গণিত ইত্যাদি বিষয় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। কিন্তু, পরিতাপ; মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড যেসমস্ত বই পাঠ্য করে, তার বেশীরভাগই অতি নিম্নমানের বলে বিশেজ্ঞদের অভিমত। পাঠ্য তালিকাভুক্ত ২১টি ইংরেজী বইয়ের মধ্যে ১৩টি বইয়ের মান ততটাই নিম্ন যে, বিশেষজ্ঞরা সেগুলোকে আলোচনার যোগ্য বলেও মনে করেন না। বাকি ৮টি নিয়ে আলোচনা করা যায়, কিন্তু পঠনযোগ্য কিনা— তা নিয়ে সংশয় আছে। এর পরিষ্কার মানে হচ্ছে, এই সমস্ত বই এমন সব লোক দ্বারা লেখানো হয়েছে, যারা আদৌ যোগ্য নন। বইগুলো লিখে জমা দেবার পর যাঁরা পাঠ্য তালিকাভুক্তির জন্য

ফাইজুস সালেহীন

অনুমোদন করেছেন, তাদের যোগ্যতা এবং সদিচ্ছা নিয়েও প্রশ্ন ওঠা স্বাভাবিক। কেন, কার স্বার্থে এইসব অপাঠযোগ্য নিম্নমানের পুস্তক মাদ্রাসা পাঠ্য তালিকাভুক্ত করা হয়? এক্ষেত্রে দুর্নীতির আশ্রয় নেয়া হয় না— এ কথা বিশ্বাস করা কঠিন।

বিভিন্ন মাদ্রাসায় নিয়োগপ্রাপ্ত একশ্রেণীর শিক্ষকের বিরুদ্ধেও নানান অনিয়মের অভিযোগ রয়েছে। একই ব্যক্তি একাধিক মাদ্রাসায় চাকরি করেন— এমন দৃষ্টান্তও আছে। ভুয়া কাগজপত্র দিয়ে মাদ্রাসায় চাকরি বাগিয়ে নেয়া না কি কোন ব্যাপারই না। অবশ্য, একথা মাদ্রাসার সকল শিক্ষকের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। অনস্বীকার্য যে, বহু মেধাবী এবং প্রকৃত ধর্মানুরাগী আলেম মাদ্রাসা শিক্ষার সঙ্গে জড়িত আছেন। শিক্ষকতা করছেন। আজকাল সাধারণ শিক্ষায় শিক্ষিত অনেক তরুণও অন্য কোনো চাকরি না পেয়ে মাদ্রাসায় শিক্ষকতা করছেন। এদের বেশীরভাগই দুর্নীতির সাথে জড়িত নয়। কিন্তু, সামগ্রিকভাবে মাদ্রাসা শিক্ষার যে চিত্র পাওয়া যায়, তা অনভিপ্রেত। ধর্মীয় আদর্শের সঙ্গে এর কোনো সাযুজ্য নেই। এই নিবন্ধকারকে এক তরুণ মাদ্রাসা শিক্ষক বলেছেন, মাদ্রাসা শিক্ষার ক্ষেত্রে ঘুষ ছাড়া যেমন কোনো কাজ হয় না, তেমনই ঘুষ দিলে খুব কম অপকর্মই আছে, যা করিয়ে নেয়া যায় না।

মাদ্রাসা শিক্ষার-এই যখন পরিস্থিতি, তখন যেসমস্ত ছেলেমেয়ে মাদ্রাসায় লেখাপড়া করে তারা কি শিখছে? এই দূষিত পরিবেশের মধ্যে ছেলেরা ধর্মবোধে উজ্জীবিত হবে কেমন করে? অথচ, ধর্মীয় শিক্ষার মূল উদ্দেশ্যই হলো পবিত্র ইসলামের মহান আদর্শে উজ্জীবিত পরহেজগার মানুষ তৈরি করা, যারা সমাজে অনুকরণীয় চরিত্রের অধিকারী হবেন। কিন্তু বাস্তবে একি হচ্ছে? এমতাবস্থায় আমাদের বক্তব্য হলো, মাদ্রাসা শিক্ষা ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে দুর্নীতিগ্রস্ততার কবল থেকে মুক্ত করা অপরিহার্য। আমরা আগেই বলেছি, সাধারণ স্কুল-কলেজেও ধর্মীয় শিক্ষার সুযোগ থাকতে পারে। মাদ্রাসা শিক্ষা বন্ধ করার কথা আমরা বলি না। আমরা জানি, তাহলে ধর্ম ব্যবসায়ী চক্র এবং সাম্প্রদায়িক রাজনৈতিক গোষ্ঠী বিভ্রান্তিকর প্রচারণা শুরু করবে। তারা দেশের সাধারণ ধর্মপ্রাণ মানুষের স্পর্শকাতর অনুভূতিকে ব্যবহার করে সত্য ও ন্যায়ের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে পানি ঘোলা করবে। এমতাবস্থায়, মাদ্রাসা শিক্ষাকে কি করে দুর্নীতিমুক্ত করা যায়, সে ব্যাপারে চিন্তাভবনা করা দরকার। সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে দুর্নীতিবাজ ব্যক্তি ও মহলের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেয়া একান্ত প্রয়োজন। আর মাদ্রাসা শিক্ষার ব্যবস্থাপনা ও পরিচালনার ক্ষেত্রে উচ্চ শিক্ষিত এবং সত্যিকারের জ্ঞানী ব্যক্তিদের যুক্ত করা প্রয়োজন। মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ডকে একটি আধুনিক প্রতিষ্ঠানে পরিণত করতে হবে। যে সমস্ত অশুভ সংঘ শক্তি মাদ্রাসা শিক্ষাকে জিম্মি করে রেখেছে— তাদের বিরুদ্ধেও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গৃহীত হওয়া বাঞ্ছনীয়। ধর্মীয় শিক্ষার আদর্শবাদিতা, উপযোগিতা সর্বোপরি পবিত্রতা রক্ষা করা আমাদের জাতীয় কর্তব্য।